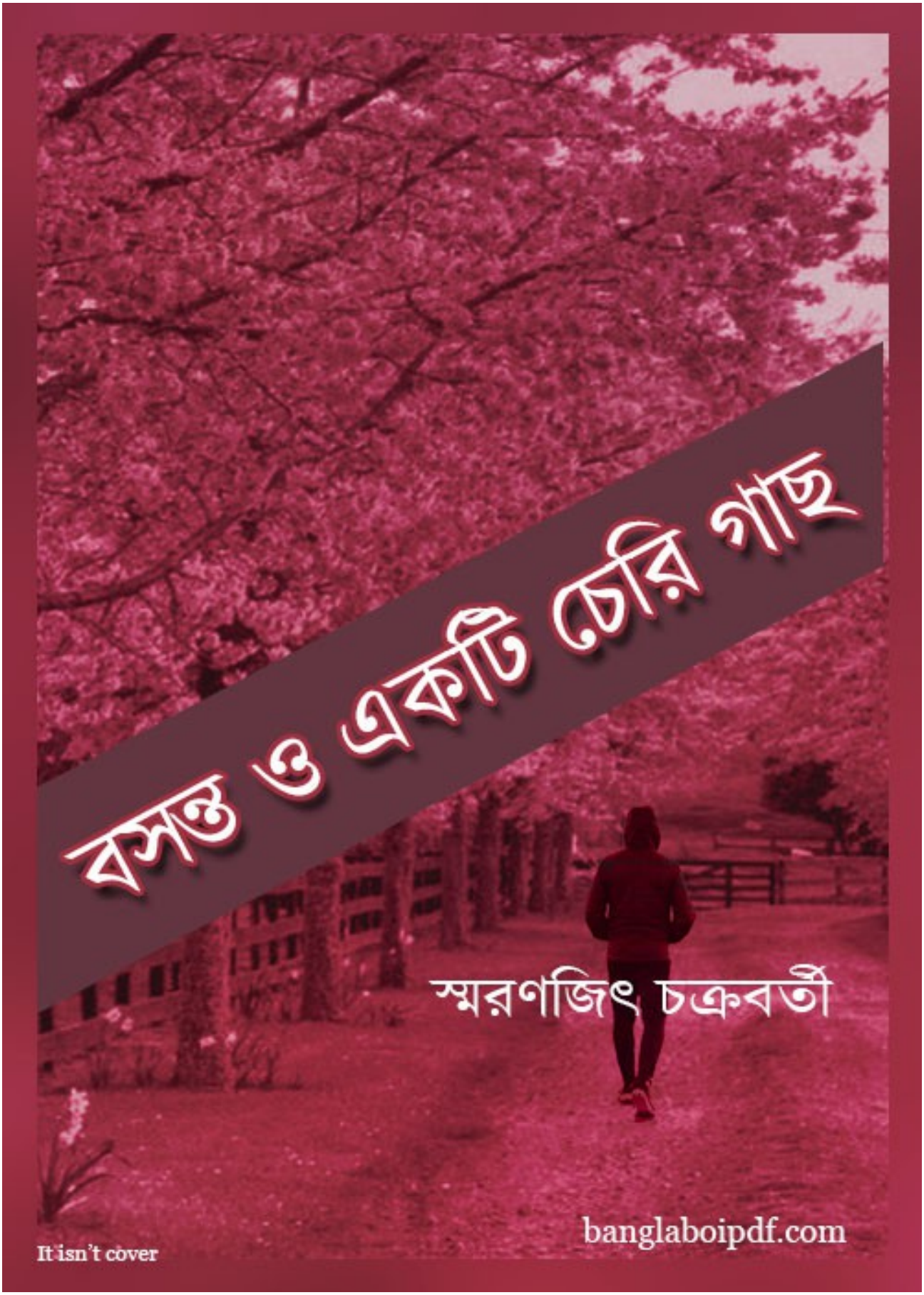
বসন্ত ও একটি চেরি গাছ
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
banglaboipdf.com
It isn't cover

বসন্ত ও একটি চেরি গাছ

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী - এর আরো বই পেতে

এখানে ক্লিক করবেন

বসন্ত ও একটি চেরি গাছ

বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম টোনি চিৎকার করছে, “আমায় ন্যাড়া করে দাও, আমি নেরুদা হব। এক মাথা চুল রেখে রাজেশ খন্না হব না।”

আমি ভাল করে শুনলাম। টোনি বলছে, “তখন থেকে বলছি ন্যাড়া করে দাও। তোমরা কেউ কি আমায় নেরুদা হতে দেবে না ? আমায় কি রাজেশ খন্না হয়েই থাকতে হবে?”

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেসময় রাজেশ খন্না খুব নামী একজন হিরো। তার মতো জামার উপর বেল্ট পরা আর-একদিকে কাকি মেরে হাঁটা ফ্যাশন। সেসময় পেট মোটা ফোলা-ফোলা মোটর গাড়ি চলে শহরের রাস্তায় আর ছোট বোতলে হাফ সার্কল ফুল সার্কল কোলা পাওয়া যায় দোকানে-দোকানে। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা ১৯৭৪ সাল। আমার বয়স তখন সবে পনেরো। মানে যে বয়সে মন আর গলা একসঙ্গে ভেঙে যায় আর কী! আমাদের শহর থেকে কলকাতা অনেক দূর, পাহাড়ের গায়ে শান্ত আর সুন্দর করে সাজানো। বাঙালি আর অবাঙালি মিলেমিশে আমরা বেশ থাকি। যেমন আমি বাঙালি হলেও আমার প্রিয় বন্ধু ভেঙ্কট কেরালার ছেলে। ভেঙ্কটের বাবা-মা নেই। মামার বাড়িতে মানুষ। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মামার গ্রোসারি স্টোরে কাজ করে ও। ভেঙ্কট লম্বা, সুন্দর দেখতে আর সিনেমার পোকা।

বলে, “জানিস টুপি, আমার জন্ম হয়েছে সিনেমার জন্য। দেখবি বড় হয়ে রাজ কপূরের ‘ববি’র চেয়েও হিট ছবি বানাব।”

ববি। না, এই ছবিটা আমি দেখিনি। ঠাকুরমা দেখতে দেয়নি আমায়।

আমার বাবা বিদেশে চাকরি করে আর আমি, মা আর ঠাকুরমার সনে এখানে থাকি। আমার মা খুব ভাল মানুষ। চুপচাপ আর শান্ত। ঠাকুমাই সংসারের কম্যান্ডার। আর তাই ঠাকুরমা আমায় মানুষ করার জন্য

নানা মাপের লক্ষ্মণরেখা আমার চারদিকে টেনে রেখেছে। এর মধ্যে একজন হল সিনেমা দেখা। ঠাকুরমার মতে, সিনেমা-বায়োস্কোপ দেখলে ছেলেপিলে খারাপ হয়ে যায়। তারা

দেদার প্রেম করতে থাকে আর তাদের পড়াশোনা ডকে ওঠে।

আমি প্রতিবাদ করলে বলে, “এই যে ব্রিগ্যাজাদের ছোট ছেলে টোনি। সিনেমা না দেখলে কি আর শার্লট টমসনের প্রেমে পড়ত ও ? আর দেখলি তো তার ফলে কোন মাথাখারাপ হয়ে গেল ওর! টোনি, ব্রিগ্যানজাদের ছোট ছেলে। 'আগে ওরা কলকাতায় থাকত। এখন এখানে থাকে। আমাদের চেয়ে এদের বাংলা পরিষ্কার। তবে টোনি স্বাভাবিক নয়। ওর বয়স আঠাশ। লম্বা আর ফরসা। কিন্তু কেমন যেন উস্কোখুস্কো! প্রায় সবসময় ওদের বাড়ির জানালার কাছে বসে থাকে একা। আর বাড়ির সামনে লাগানো চেরি গাছটার দিকে তাকিয়ে বলে, “যখন বসন্ত আসবে এই পাড়ায়, চেরি গাছ লাল হয়ে উঠবে। আর তখনই শার্লট ঠিক ফিরে আসবে আমার কাছে।”

চেরি গাছ এখানে হবে না। এই মাটিতে নাকি চেরি গাছ ভাল হয় না। আমার ঠাকুরমা বলে। ভেঙ্কটের মামা বলে। মাংসর দোকানের ইব্রাহিমদা বলে। এমনকী আমাদের বায়োলজির টিচার ম্যাডাম চোপড়াও বলেন। কিন্তু টোনিকে সেসব বলা যায় না। বললেও শোনে না যে! 'ও জেদ করে চেরি গাছ আনিয়ে লাগায় বাড়ির সামনে। মারা গেলে আর একটা লাগায়। আর আমি দেখি শার্লট নামে কোনও এক মেয়ের জন্য টোনি অধীর অপেক্ষা করে থাকে কখন বসন্ত আসবে! অপেক্ষা করে, কখন লাল হয়ে উঠবে চেরি গাছ। মাঝরাতে ব্যালকনিতে এসে দাড়িয়ে মাঝে-মধ্যে দেখি, দূরে টোনির একতলার ঘরে আলো জ্বলছে। শুনি টোনি চিৎকার করছে....

"I go so far as to think that you own the universe. I will bring you happy flowers from the
mountains, bluebells,
dark hazels, and rustic baskets of kisses.
I want to do with you what spring does with the cherry trees."

২

শুধু টোনিই নয়। ওদের বাড়ির আর-একটা অদ্ভুত বস্তু হল পল। লেজ কাটা ডোবারম্যান। পল যেমন বড়, তেমন রাগী।

এক-একটা লোক থাকে না, যারা সবসময় হাতে মাথা কাটে। পল ঠিক সেরকম। আমি যখন জানালার পাশে দাড়িয়ে টোনির সঙ্গে কথা বলি পল চিৎকার করে। যখন ওদের চেরি গাছের ডালে হাত দিই, তখনও পল চিৎকার করে। ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেই পল চেঁচিয়ে কানের পরদার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। বড় নচ্ছার এই পল, আমার এমনই মনে হত। কিন্তু তখন কি আর বুঝেছি যে, পলের জন্য আমার পৃথিবীটাই এমন করে বদলে যাবে। কিন্তু সেসব কথা বলার আগে দু-একটা অন্যকথা বলে নেওয়া দরকার।

আমাদের এই পাহাড়ি শহরটার এক কোণে বাস টার্মিনাস। আর তার পাশের ঢাল থেকেই রডোডেনড্রন আর পাইন গাছের লম্বা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভিতরে একটা আধভাঙা বাড়ি আছে, সকলে বলে সাহেব ভিলা। বিকেলে আমি মাঝে-মাঝে ওই বাড়িটায় যাই। এখানে প্রচুর রঙিন ভাঙা কাচ পড়ে থাকে। আমি সেখান থেকে নানা রঙের কাচের টুকরো জোগাড় করে আনি। তারপর মাটির চ্যাপ্টা প্লেটের উপর আঠা দিয়ে জুড়ে ছবি বানাই। এমনই একদিন ফ্লোরেন্সের দোকান থেকে আইসক্রিম কিনব বলে দাড়িয়েছি, ঠিক তখনই তাকে দেখলাম। হলুদ সিঙ্গল পাউন্ড রুটির মতো দেখতে বাস থেকে নেমে আসছে সে। তার হালকা বাদামি চুল পড়ে আছে কপালের এক পাশে। নীল স্কার্টের উপর সাদা-লালের ববি প্রিন্ট যেন আলো করে রেখেছে চারপাশ! সে বাস থেকে নেমে মাটিতে পা রাখল আর আমাদের ছোট পাহাড়ি শহর কেপে উঠল মেনি ! চোখে কার পড়েছে এমন অবস্থা নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখি ভোট বসে আছে।

আমি ওকে দেখে বললাম, “মাইরি একজন এসেছে আজ। বাসস্টপে দেখলাম, জানিস? সারা শহর অবশ্য দেখেই গলায় বিব বেঁধে নিয়েছে।”

ভেঙ্কট অনিচ্ছার সঙ্গে মুখ তুলল, “কে?” আমি বিস্তারিতভাবে বললাম সব। তারপর উত্তেজিত হয়ে বললাম, “এমন সুন্দরী জীবনে দেখিনি আমি। একেবারে যেন... একেবারে

যেন...।"

“লিজ টেলর।” ভেঙ্কটের মুখে এখন বিরক্তি। “টেলর ? দর্জি? দেখে তো দরজি মনে হল না। দেখে তো বেশ ইয়ে...!” “পাঠা,” ভেঙ্কট এমন মুখ করল যেন আমি ইব্রাহিমদার মিট শপের দড়ি ছিড়ে

পালিয়ে এসেছি।

‘মানে? এমন কেন বলছিস?” আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

ঠাকুরমার গুড নাতি হয়ে আর কতদিন থাকবি? এজন্যই বলি ম্যাজেস্টিকে গিয়ে একটা-আধটা ইংরেজি মুভি দ্যাখ। লিজ টেলর মানে এলিজাবেথ টেলর। দর্জি নয়, হলিউডের হিরোইন। ফাটাফাটি। ৩৬ ২৪ ৩৬। বুঝেছিস? "তুই ফোন নম্বরও জোগাড় করে ফেলেছিস?” আমি অবাক হলাম। তবে না হলেও পারতাম। ভেঙ্কট সিনেমার পোকা। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।। ভেঙ্কট কপাল চাপড়ে বলল, “শালা,

এ কে রে? বলছি বাবা, বুঝছে। হাবা! আমি দেখেছি মেয়েটাকে।” আমি বললাম, “তাই? আমার এখনও হাত-পা কাঁপছে জানিস? আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আমি প্রেমে পড়েছি!”

ভেঙ্কট অবজ্ঞার চোখে তাকাল, “একবার দেখেই প্রেম! শোন, এসব ছাড়। এ পাতি কাফ-লাভ।”

আমি রেগে গেলাম, "তুই আমাকে আমার চেয়ে বেশি জানিস? আমি প্রেমেই পড়েছি। বুঝেছিস? এই বুদ্ধি নিয়ে। তুই রাজ কপুর তো ছাড় কোটাল কপূরও হতে পারবি না।" ভেঙ্কট রাগ-রাগ মুখ করে বলল,

"এই তুই আমার বন্ধু। এমন বলছিস!"

“তেইও কি আমার বন্ধু ?" আমি পালটা বললাম, আমি প্রেমে পড়েছি জেনে এমন নিমপাতা খাওয়ার মতো মুখ করে আছিস কেন? বন্ধুত্ব নিয়ে ফালতু জ্ঞান দিবি না।”

ভেঙ্কট বলল, “ঠিক আছে, দেখা যাবে। আর শোন, আমি যদি ডিরেক্টর না হতে পারি তবে জানবি টোনিদের গাছেও কোনওদিন চেরি হবে না।”

৩

মেয়েটির নাম নাইসা। নাইসা দেশাই। আমাদের স্কুলে এসেই ভর্তি হয়েছে। তবে আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে। কোথায় যেন থেকেও নেই এমন একটা অবস্থায় পড়লাম আমি। এক ক্লাসের বড়কে কেউ 'দিদি' বলে? ভেঙ্কট আমার চেয়ে দু বছরের বড়, কই ওকে তো আমি 'দাদা বলি না। তাই নাইসাও মোটেই 'দিদি নয়। কিন্তু আমি মনে মনে যতই এসব ভাবি না কেন, নাইসার পিছনে নিমেষের মধ্যে বিরাট লাইন পড়ে গেল। পাড়ার ঝন্টুদা, বেপাড়ার মঙ্গল, ক্লাস টুয়েলভের মাধবন সকলেই নাইসার পিছনে ঘুরতে লাগল। আমি দূর থেকে এসব দেখে জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগলাম একদম। রাতে ভাল করে ঘুম নেই। খেতে ইচ্ছে করে না। অকারণে রাগারাগি করি। এমনকী, ভেঙ্কট এলে। পর্যন্ত ভাল করে কথা বলি না। আমি শুধু তেতো মুখে দেখি নাইসা সারা পৃথিবীকে উপেক্ষা করে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে স্কুল-পথে, যেন ওটাই ওর বোর্ড এগজ্যামের সিলেবাস।

আমার কষ্ট বাড়তে লাগল। নাইসা যে আমায় লক্ষই করে না। আমি বলে যে একটা ছেলে আছি সেটা তো ও জানেই না। কাকে বলব এই দুঃখের কথা ? কোন বন্ধু বুঝবে এসব?

খারাপ ব্যবহার করতাম বলেই হয়তো আমার বাড়িতে আসা প্রায়। বন্ধ করে দিয়েছিল টে। বাজারে ওর মামার দোকানের সামনে আমি ওকে ধরলাম।

ভেঙ্কট আমায় দেখে কেমন যেন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল! আমি তাও ছাড়লাম না। বললাম, "জানিস ভেঙ্কট আমি মরে যাব এবার..."

"কেন? কী হয়েছে? পেট খারাপ?" ভেঙ্কট হাসল।

নাইসা। ওকে না পেলে দ্যাখ, আমি ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে লাফ দিয়ে মরব।"

"কেন পাগলামো করছিস?" ভেঙ্কট বিষধা হল এবার। "তুই আমার হয়ে বল না ওকে। তোর মামার দোকান থেকে তো ওদের বাড়িতে তুই মালপত্তর পৌছে দিয়ে আসিস। তা ছাড়া সেদিন মা বলল ওর সঙ্গে নাকি তুই টাউন লাইব্রেরি গিয়েছিলি! মা দেখেছে। তোর তো চেনাশোনা আছে, প্লিজ বলে দে..."

"কী বলছিস? আমি? মামা জানতে পারলে আমার ছাল তুলে নেবে। জানিসই তো মামার

বাড়িতে কেমন করে পড়ে থাকি! এতটা নির্লজ্জ তুই!" আমি রেগে গেলাম, "ভুলে গেলি আমার বাড়িতে তোকে ডেকে কত খাইয়েছে মা-ঠাকুরমা। কত জামাকাপড় কিনে দিয়েছে। আর তুই এমন নেমকহারাম!"

"শোন না," ভেঙ্কট বোঝানোর চেষ্টা করল, "বাড়িতে দিল্লি থেকে মামার বন্ধু খান আঙ্কল এসেছে। এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রীও এসেছে ওর সঙ্গে। ছেলেটা মাথা খারাপ করে দিচ্ছে পাহাড় ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। মামাও বলছে নিয়ে যেতে। খুব ছটফটে আর ব্রাইট ছেলে। ন' বছর বয়স। নাম শাহরুখ। ওকে নিয়ে বেরোতে হবে রে। অন্যদিন শুনব তোর কথা।"

"পালাচ্ছিস? কে এমন হরিদাস পাল এই শাহরুখ? তার জন্য তুই। আমায় ইগনোর করছিস?"

এবার ভেঙ্কটও মাথাগরম করল, "দ্যাখ টুপি, নিজের দম নেই তোর, আমায় বলছিস? আর শাহরুখ কে, সেটা তোর না জানলেও চলবে। যা করার নিজে কর, বুঝলি?"

৪

সকলে বলে নিজে কর। কিন্তু কী করে করতে হবে, সেটা কেউ বলে না। আমি তাই মনখারাপ করে সেদিনের পর থেকে হেঁটে বেড়াতাম ছোট্ট পাহাড়ি শহরে। ফ্লোরেন্সের আইসক্রিম পার্লারের পাশের রাস্তা দিয়ে আমি একা-একা হেঁটে যেতাম নাইসাদের বাড়ির দিকে। আমার পাশ দিয়ে স্যামসন বেকারির নীল ভ্যানটা দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে যেত নীচের শহরে। আমি একা-একা গিয়ে বসে থাকতাম ওয়াচ টাওয়ারের পাশের সবুজ বেঞ্চে। দেখতাম পাখিরা জড়ো হচ্ছে সানসেট লেকের জলে। দেখতাম, নিজেদের ব্যালকনিতে দাড়িয়ে সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে নাইসা। তারপর ঘটনাটা ঘটল। নাইসার স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা আরও চওড়া করার জন্য সরকার থেকে লোকজন নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে জড়ো করল একদিন। রাস্তা খুঁড়ে, ইটের স্তুপ করে, পিচের টিন জ্বাল দিয়ে পুরো পথটাই বন্ধ করে দিল ওরা। আর তার ফলে নাইসা

স্কুলে যেতে শুরু করল আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। সেই যাতায়াত শুরুর এক সপ্তাহের মাথায় ঘটনাটা ঘটল। দিনটা এখনও মনে আছে আমার। অক্টোবরের শুরু ছিল সেটা। সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নাইসা স্কুলের দিকে এগিয়ে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। রাস্তাটা আমাদের বাড়ির সামনে থেকে একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গিয়েছে ব্রিগ্যানজাদের বাড়ির দিকে। আমি সেই বাঁকের কাছে যেতেই চিৎকারটা শুনলাম। খুব চেনা চিৎকার। পলের। আমি প্রায় ছুটে গেলাম সেদিকে। চেরি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাইসা। আর ওর হাত কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে দাত-মুখ খিচিয়ে গড়গড় করছে পল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম পলের গলার চেন খোলা। চেরি গাছের কাছে দাড়িয়ে থরথর করে কাপছে নাইসা আর পল সমস্ত প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকদের এজেন্ট হিসেবেই হয়তো একটা ফয়সালা করতে এসেছে যেন। কিন্তু আমি কি তা হতে দিতে পারি?

আমি ভুলে গেলাম না, মামি রোগ, বেটে। ভুলে গেলাম, আমি খুব ভিতু। তার বদলে দ্রুত পিঠের ভারী ব্যাগটা খুলে আমি নিমেষের মধ্যে ছুড়ে মারলাম। পলের দিকে। ইটের মতো ভারী আর শক্ত ব্যাগ, যেটা আমায় মানুষ থেকে কচ্ছপ বানিয়ে ছাড়ে, সেটা গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল পলের মুখে। পল পড়ে গিয়ে পিছু হটলো। আর আমি সেই সুযাোগে পথের পাশ থেকে দুটো ইট তুলে নিয়ে নাইসাকে আড়াল করে দাড়ালাম।

পল সাহস পাচ্ছে না সামনে আসতে। কিন্তু প্রচণ্ড চিৎকার করে যাচ্ছে আর মাটি আঁচড়াচ্ছে। ভয় দেখানোর জন্য আমি একটা ইট ওর পায়ের কাছে ছুড়ে মারলাম। পল আরও চিৎকার করতে থাকলে, সঙ্গে পিছুও হটল একটু। আমি আরও এক পা এগোলাম। ইট তুললাম আর একটা। কিন্তু আর ছোড়ার দরকার পড়ল না। ব্রিগ্যানজাদের বড় ছেলে মাইকেল একটা লাঠি আর চেন নিয়ে। বেরিয়ে এল বাইরে।

তারপর ‘পল' বলে চিৎকার করে দু'বার লাঠিটা আছড়াতেই পল কেমন যেন গুটিয়ে গেল! মাইকেল ওর গলায় চেন পরিয়ে বলল, “সরি, টোনি খুলে দিয়েছিল।”

ওরা চলে যেতে আমি নিজেকে সামলালাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে, আমি তো খুব ভিতু! আমি পিছনে ঘুরলাম আর সঙ্গে-সঙ্গে। আমার দম বন্ধ হয়ে গেল। হাল্কা পেপারমিন্টের গন্ধ আসছে... নাইসা দাড়িয়ে রয়েছে দু'হাত দূরে! এই প্রথম এত কাছ থেকে

দেখলাম নাইসাকে। বাদামি চুল, পদ্মের পাপড়ির মতো গায়ের রং। মাখন থেকে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কেটে বের করা মুখ। মনে হল আমার পা দুটো নরম মাটির তৈরি! আমার শরীরের ওজন ধরে রাখতে পারবে না। তবে সমস্ত ভালবাসার মেয়েদের সামনে গিয়ে দাড়ানোর একটাই নিয়ম, বুঝতে না দেওয়া। আমিও বুঝতে না দিয়ে ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে ঝেড়ে নিয়ে বললাম, "আর ভয় নেই।"

নাইসা বলল, "তোমার তো খুব সাহস!" আমি কায়দা করে হেসে বললাম, "ও কিছু নয়।"

নাইসার চোখের জল গালের উপর গড়াল, "তোমার যদি কিছু হয়ে যেত?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নাইসার দিকে। উত্তর থেকে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা এল আচমকা। লম্বা পাইন বনের মাথায় দোল খেল। মেঘ! স্যামসন বেকারির নীল গাড়িটা চলতরঙ্গের মতো হর্ন বাজিয়ে মিলিয়ে গেল দুরের জঙ্গলে। আর আমি দেখলাম সানসেট লেকের জল এসে ছুয়ে যাচ্ছে আমায়! কাদছে, নাইসা কাদছে। কিন্তু কার জন্য? পলের জন্য নিশ্চয়ই নয়। তবে? তবে কি আমার জন্য?

৫

ওই যে পলকে আটকে দিলাম তারপর থেকে নাইসার ছেলে বন্ধুর একমাত্র পদটা পেয়ে গেলাম আমি। স্কুল থেকে ফেরার সময় নাইসা বাবার সঙ্গে গাড়িতে চেপে ফিরলেও স্কুলে যাওয়ার পথে আমরা একসঙ্গে যেতাম। আর টোনিদের বাড়ির সামনে এলেই ও শক্ত করে ধরে থাকত আমার হাতটা। আর আমি ভাবতাম স্কুল পর্যন্ত প্রত্যেকটা বাড়িতেই এমন লক্ষ্মীসোনা টাইপ কুকুর থাকে না কেন!

এ ছাড়াও ছুটির সময়ে কোনও-কোনওদিন নাইসা বাড়িতে আসত আমাদের। আমার তৈরি করা ছবি দেখত। গল্প করত মায়ের সঙ্গে। আমার আলুক-ঝালুক হয়ে থাকা পড়ার টেবল গুছিয়ে দিত দ্রুত হাতে। তারপর পেপারমিন্টের হাল্কা মনখারাপি গন্ধ রেখে চলে যেত। আর আমি ভূতে পাওয়া মানুষের মতো সেই গন্ধ লক্ষ করে ঘুরে বেড়াতাম সারা বাড়ি। তবু বন্ধু স্টেটাসটা আর আমার ভাল লাগছিল না। আসলে মানুষ চেয়ারে বসতে পেলে কোলে বসতে

চায়। আমিও তাই চাইতে শুরু করলাম। আর চাইব নাই বা কেন? আচ্ছা, তোমরাই বলো, একটা অমন মেয়ে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার হাত ধরছে। বই গুছিয়ে রাখছে। কেক তৈরি করে আনছে। তাকে সবসময় শুধু বন্ধু বলে মানতে হবে আমায় দেশে কি আইনকানুন বলে কিছু নেই? ন্যায্য বিলি-ব্যবস্থা বলে কিছু নেই?

এসব ভাবতে-ভাবতে একদিন রবিবারের দুপরে গুম মেরে বসে। আছি। ডিসেম্বর মাস, সারা সকাল নরম তুলোর মতো বরফ পড়ার পর শহর এখন শান্ত। শুধু ঘর-বাড়ি, গাছপালা আর সাবেক ল্যাম্পপোস্টের মাথায়-মাথায় চুড়ো করা থার্মোকলের মতো বরফ লেগে আছে। ঠিক এমন সময় দৌড়তে-দৌড়তে এসে বারান্দায় উঠল ভেঙ্কট। "এমন থম মেরে বসে আছিস কেন? সিনেমা দেখবি?" "সিনেমা?"

আমার বিরক্ত লাগল। "হ্যা, ব্যাপক ঝাড়পিটের একটা সিনেমা এসেছে। রিলিজের সময় দেখা হয়নি। আবার ঘুরে এসেছে। রোগা-লম্বা মতো এক হিরো আছে। কথা কম, বন্দুক বেশি টাইপ। ম্যাজেস্টিকে বড় পোস্টার পড়েছে। সিনেমাটার নাম 'জঞ্জির। আর হিরোটা...আরে, ওই যে রে... অমিতাভ বচ্চন। যাবি?" 'ভাগ, খেকিয়ে উঠলাম আমি। এমনিতেই আমার মন-মেজাজ ভাল নেই। আর সেখানে ও এসেছে কে এক বচ্চনের কথা বলতে। বললাম, "হিন্দিতে অমন হিরো অনেক এসেছে, গিয়েছে, "না রে, এ স্পেশ্যাল জিনিস। আমার ডিরেক্টর ইন্সটিট বলছে এ লম্বু লম্বা রেসের ঘোড়া," ভেঙ্কট বিজ্ঞের মতো বলল। "ভেঙ্কট, আমায় যখন নাইসার ব্যাপারে হেল্প করবি না, তখন অন্য কোনও ব্যাপার নিয়ে কথা বাড়াস না। সোজা কেটে পড়।"

"আরে, ও তোর বন্ধু তো এখন। তাতেও সাধ মেটেনি?" "তুই কী করে জানলি? তুই তো আমার বাড়িতে আর আসিস না।" ভেঙ্কট হাসল, "এজন্য কি আর আসতে হয়? গোটা পাহাড় জানে।" "ওকে না পেলে আমি মরে যাব," আমি আর আটকাতে পারলাম নিজেকে।।

ভেঙ্কট চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "তা হলে ওকে বল। দ্যাখ, ও কী বলে!"

"বলব?" আমি ঠোট চেটে ভেঙ্কটের দিকে তাকালাম।। ভেঙ্কট বারান্দা থেকে নেমে চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাড়িয়ে বলল, "ইচ্ছে হলে বলবি। জীবনটা তো তোর।"

“তুই আমার সঙ্গে থাকবি না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। ভেঙ্কট বলল, “না থাকলে কি নেমকহারাম বলবি আবার? শোন, এসব একাই করতে হয়। শুধু তো একটা মেয়ে। অত ভয়ের কী আছে!”

৬

জাস্ট একটা মেয়ে বলেই তো প্রবলেম। বাঘ, ভল্লুক হলে কি আর প্রবলেম ছিল? দিতাম বলে খাঁচার বাইরে দাড়িয়ে। কিন্তু এখানে তো সেটা সম্ভব নয়। বরং এখন মনস্থির করে সামনে এগোনোর সময়। আমি মনে-মনে দিন ঠিক করলাম, ৩১ ডিসেম্বর। সেদিনই আমার সম্মুখ সমর। আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম। স্নান করতে গিয়ে, রাতে শুয়ে, স্কুল থেকে ফেরার পথে বা সাহেব ভিলায় কাচের টুকরো জড়ো করতে করতে আমি নাইসাকে প্রপোজালের স্ক্রিপট কাটাকুটি করতে লাগলাম আর প্রতিবার নিজের তৈরি করা ডায়ালগ ভুলতে লাগলাম। তারপর দিন এল। বছরের শেষদিন। নতুন বছর আসছে। সাজগোজ করে এবং মনে সাহস নিয়ে দাড়ালাম ম্যালের নীচের রাস্তায়। হিলা ইউনিয়ন ক্লাবে নাইসাদের একটা ইয়ার এন্ড পার্টি আছে। জানতাম, সন্ধ্যের মুখে বন্ধুদের সঙ্গে নাইসা আসবে। পরে ওর বাবা-মা আসবে। সেই সুযোগেই আমায় যা বলার বলতে হবে। বেলুন, রিবন আর আলোর ফুলস্টপ দিয়ে সারাটা শহর সেজে রয়েছে বছরের শেষ দিনটায়। শীত উপেক্ষা করে মানুষজন আনন্দ করছে রাস্তায়। তবে এসবই ম্লান হয়ে গেল যখন নাইসা পথে যেতে যেতে আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে এসে দাঁড়াল সামনে, “তুমি?”

আমি কোনও কথা না বলে আমার হাতে ধরে থাকা ফুল তার চকোলেট বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

নাইসা ঘাবড়ে গেল, “এসব কেন?” আমি কিছু না বলে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম। আকাশে নৌকোর মতো চাঁদ আর তার পিছনে উজ্জ্বল হিরের মতো একটা তারা। বললাম, “দ্যাখো, নৌকোটাকে কেমন অনুসরণ করছে তারাটা।”

“তো?” নাইসা অবাক হল।

আমি শ্বাস নিলাম বড় করে। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সাহস ভরে নিয়ে বললাম, "আমিও তোমার জন্য এমন।"

নাইসা কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে রইল স্থির চোখে। তবে কি বুঝল ? আমি কঁপা গলায় বললাম, "আমি তোমার তারাটি। আমি তোমার চেরি গাছের ফল। আমি তোমায় ভালবাসি নাইসা!"

নাইসা আমার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। সন্ধে ঘন হচ্ছে আরও। তার মাঝে কাপা আলোয় আমি স্পষ্ট বুঝলাম না ওর চোখের ধাঁধাগুলো। বুঝলাম না আমি কোথায় দাড়িয়ে রয়েছি। আমি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি বলবে না কিছু ?"

নাইসার চোখ কাপল এবার। হাসল সামান্য। তারপর বলল।

৭

এরপর ছত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। আশপাশের সমস্তটাই বদলে গিয়েছে। স্যামসন বেকারির সেই নীল গাড়িটা আর চলে না। ফ্লোরেন্সের আইসক্রিম পার্লার আজ সাইবার ক্যাফে। ইব্রাহিমদার মিট শপ পালটে এখন জয় মাতাদি টুরিজমের অফিস। আমাদের পাইন, রডোডেনড্রনের জঙ্গলও পিছিয়ে গিয়েছে কিছুটা। সাহেব ভিলায় এখন সরকারি দপ্তর। শুধু আমাদের পাড়াটা আজও যেন একই রকম রয়ে গিয়েছে। আজও এখানে দেবদারু বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যায় চাদ। আজও ব্রিগ্যাঞ্জারা নতুন-নতুন চেরি গাছ লাগিয়ে রাখে বাড়ির সামনে।

আমার একটা ছোট একশপ আছে। তাতে চারজন কাজ করে। গ্রাস পেন্টিং আর মাঝেইকের ছবি তৈরি হয় সেখানে। মা-ঠাকুরমা, বাবা আর কেউই নেই এই পৃথিবীতে। ভোটও চলে গিয়েছে মুম্বই। এখন ও নামকরা ডিরেক্টর। চেরি গাছ তার কথা না রাখলেও ভেঙ্কট কথা রেখেছে। ও আমায় চিঠি দেয় মাঝে-মধ্যে। কিন্তু আমি জবাব দিই না একটারও। সকলে চলে গিয়েছে। শুধু আমিই যেতে পারিনি কোথাও আমি যেন। আজও দাড়িয়ে রয়েছি সেই নীচের রাস্তায়। যেন আজও তেমনই গাঢ় হচ্ছে সন্ধে। যেন আজও

শুনতে পাচ্ছি নাইসা বলছে, “আমি তোমার বন্ধু। এই শহরে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু প্রেমিক নও। কিছুতেই নও। আমি তোমায় সেরকমভাবে দেখি না যে। আমি যে ভেঙ্কটকে ভালবাসি। ভেঙ্কট খুব ভাল ছেলে। দ্যাখো, তুমি আমায় ভালবাসো জেনেও ও তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে বাধা দেয়নি। তুমি আমায় প্রপোজ করবে জেনেও তোমায় বারণ করেনি। বরং আমায় স্বাধীনতা দিয়েছে আমার মতো করে বেছে নেওয়ার। ভেঙ্কট খুব বড় মাপের মানুষ। তোমার প্রতি ওর বন্ধুত্বও অনেক বড়। ও বলেছে, টুপিকে কষ্ট দিতে পারবে না কিছুতেই। বলেছে, তুমি আর তোমার বাড়ির লোক ওর জন্য যা করেছ তা ও ভুলতে পারে । । কিন্তু আমি কী করব বলো? আমি তো ভেঙ্কটের। শুধুমাত্র ভেঙ্কটের। তুমি প্লিজ রাগ কোরো না। ভুল বুঝো না, কেমন?”

জীবন কি হিন্দি সিনেমার পনেরো রিল যে, বন্ধুর জন্য এমন করতে হবে? কে বলেছিল ভেঙ্কটকে এমন করতে? কিন্তু ভেঙ্কটই বা কী করবে? সে সময়টাই যে ছিল এমন। মানুষজনও ছিল অন্য পৃথিবীর।।

এখন পৃথিবী অনেক নির্জন। এখন আর বন্ধুর চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। বরং একা-একা কাঠের বারান্দায় দাড়িয়ে আমি হাওয়ার ফিসফিস শুনি। আমি ভুল বুঝি না। জানি ভেঙ্কট কোথায় যেন হারিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমায়। সেই হেরে যাওয়ার বিন্দু থেকে তো আজ পর্যন্ত একাই আছি আমি। কিন্তু তা শুধু কি নাইসার জন্য ? কী জানি। সেই সময়ের পর থেকে তো সেরকম ভালই লাগল না কাউকে। তাই আমি একাই ভাল।।

এখন রাতে, জ্যোৎস্নায়, স্বপ্নে ধুয়ে যাওয়া ছবির মতো জেগে থাকে পাহাড়ি রাস্তা। মেঘের উপর ভেসে থাকে চাঁদ। আর আমি দেখি তার পিছনে, একটু অন্ধকার কোণায় আজও চকোলেট আর ফুল হাতে নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে একলা তারাটি। মহৎ কিছু হওয়া হয়নি আমার। আমি পারিনি অন্য কোথাও যেতে। অন্য কারও হওয়াও হল না এ জীবনে। এখন আমি শুধু ভাঙা কাচ আর রঙিন পাথরের টুকরো জুড়ে-জুড়ে হাসি-খুশি পৃথিবীর ছবি বানাই। পুরনো চেরি গাছের জায়গায় নতুন চেরি গাছ আসে। তবু তাতে চেরি আসে না কিছুতেই। আর এরই মাঝে কখনও কখনও মধ্য রাতে আচমকা চিৎকার করে ওঠে টোনি,

“I want to do with you what winter does with the cherry

trees.”

বছরের পর-বছর পেরোতে-পেরোতে কখন spring সরিয়ে কবিতায় জায়গা করে নেয় winter। বৃদ্ধ টোনির গলার স্বর প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় নির্জন পাহাড়ে। করোটি রঙের আলোর ভিতর দাঁড়িয়ে থাকে শুন্য চেরি গাছ। তাকে রক্তিম করতে আর কোনও বসন্ত আসে না এ পাড়ায়।

এই লেখকের আরো বই পেতে **এখানে ক্লিক করবেন**।